‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬’ শীর্ষক খসড়া আইনের বিশেষ বিধান- একটি পর্যালোচনা

সীমা দত্ত ও অনুপম সৈকত শান্ত

গত ৮ ডিসেম্বর ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৬’ শীর্ষক বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। এর আগে গত ২৪ নভেম্বর এই খসড়া বিল মন্ত্রীপরিষদ চূড়ান্ত অনুমোদন করে। এই খসড়া আইন প্রচলিত বিভিন্ন আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং পশ্চাদপসরণ। এটি বাল্যবিবাহ উৎসাহিত ও শিশু কন্যাদের জীবনে নানা জটিলতা ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করবে বলে যৌক্তিক আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। কেন? বর্তমান প্রবন্ধে এই খসড়া আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিশদ বিশ্লেষণ করে এর উত্তর স্পষ্ট করা হয়েছে।

সংসদে উত্থাপিত এই বিলে বলা হয়েছে, “এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারীর সর্বোত্তম স্বার্থে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না”। বিলটি উত্থাপন করেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে বিলটি উত্থাপনের বিরোধিতা করেন বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মো. ফখরুল ইমাম। স্বাভাবিকভাবেই একতরফা এই সংসদে তার প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। পরে বিলটি অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে কমিটিকে এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

দুই বছর আগে ২০১৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরও মন্ত্রিপরিষদ একবার ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪’ খসড়া আইনে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছিল। এই খসড়ায় বাল্যবিবাহের সাথে জড়িতদের সাজা ও জরিমানা উভয়ই বাড়ানোর প্রস্তাব থাকলেও একই সাথে এটি নারী ও পুরুষ উভয়েরই বিয়ের ন্যূনতম বয়স কমানোর প্রস্তাব করেছিল। সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত খসড়া আইনে প্রস্তাব করা হয়েছিল, নারীর ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৬ এবং পুরুষের ন্যূনতম বিয়ের বয়স হবে ১৮ বছর। ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সরকার সেবার পিছিয়ে এসেছিল। দুই বছর অপেক্ষা করে মন্ত্রিসভা এবার এই খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিল। এখন অপেক্ষা কেবল সংসদীয় কমিটির চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার। আগেরবার যদি মেয়ের বিয়ের বয়স দুই বছর কমানোর চেষ্টা হয়ে থাকে, এবার সেটি কমানো হয়েছে পুরা ১৮ বছরই। কেননা এই খসড়া আইনে ‘বিশেষ বিধান’ নামক ১৯ নম্বর ধারায় ‘বিশেষ প্রেক্ষাপটে আদালতের অনুমতি নিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সর্বোত্তম স্বার্থে বিয়ে দেয়ার বিধান রাখা’র যে অদ্ভুতুড়ে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তাতে ন্যূনতম কোনো বয়সের কথা উল্লেখ নেই, অর্থাৎ এতে আদালতের অনুমতি মিললে মাত্র জন্ম নেয়া শিশুকেও বিয়ে করার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধা থাকবে না।

১৯ নম্বর ধারায় ‘বিশেষ প্রেক্ষাপটে আদালতের অনুমতি নিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সর্বোত্তম স্বার্থে বিয়ে দেয়ার বিধান রাখা’র যে অদ্ভুতুড়ে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তাতে ন্যূনতম কোনো বয়সের কথা উল্লেখ নেই, অর্থাৎ এতে আদালতের অনুমতি মিললে মাত্র জন্ম নেয়া শিশুকেও বিয়ে করার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধা থাকবে না।

বর্তমানে প্রচলিত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (১৯৮৪ সালে সংশোধিত) এর ধারা ২(ক) ও (খ) অনুযায়ী : “(ক) শিশু বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যার বয়স পুরুষ হইলে একুশ বৎসরের নীচে এবং নারী হইলে আঠার বৎসরের নীচে। (খ) বাল্যবিবাহ বলতে ঐ বিবাহকে বুঝায়, যার চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণের যে কোন একপক্ষ শিশু।” অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সের নারী শিশু হিসেবে পরিগণিত এবং ১৮ বছরের নিচের নারীশিশুকে বিয়ে করা বাল্যবিবাহ হিসেবে আইনত দণ্ডনীয়। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (১৯৮৪ সালে সংশোধিত) এর ধারা ৪ (একুশোর্ধ পুরুষ বা ১৮ বছরের বেশি বয়সী নারী যথাক্রমে কোন শিশু নারী বা পুরুষকে বিবাহ করলে), ধারা ৫ (বাল্যবিবাহ পরিচালনাকারী), ধারা ৬ (অভিভাবক) অনুযায়ী শাস্তি ছিল : “এক মাস পর্যন্ত বিনা শ্রম কারাবাসে, এক হাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য জরিমানায় বা উভয়বিধ দণ্ডে শাস্তিযোগ্য হবেন।” আইনগতভাবে এই বাধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার বিশেষ কমেনি, বরং বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহের হারের দেশগুলোর মধ্যে ওপরের সারিতে অবস্থানকারী দেশ। এর কারণ এই বাল্যবিবাহ আইনের প্রয়োগে দুর্বলতা, আইন অমান্যের জন্য কঠোর শাস্তির অভাব, আইন প্রয়োগের জন্য বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভ্রাম্যমাণ আদালত-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির অনুপস্থিতি এবং অন্যান্য আইন, বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ এর সাথে বিরোধ প্রভৃতি। এই কারণগুলো দূর করা, তথা শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিধান, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুর্বলতা দূর করা প্রভৃতি দাবি দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের দেশের প্রগতিশীল অংশ তথা নারী অধিকার রক্ষায় সংগঠনগুলো তুলে এসেছিল। সেদিক দিয়ে পুরনো বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বাতিল করে আধুনিক ও যুগোপযোগী আইন গড়ে তোলা ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রস্তাবিত খসড়া আইন পুরনো আইনকে বদলে আধুনিক করার পরিবর্তে একে আরো পেছনের দিকেই ঠেলে দেয়া হলো।

বাল্যবিবাহ নারীর মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আর ‘অপ্রাপ্তবয়স্ক’ নারীর বিবাহ মানে তা শিশু বিবাহ। শিশু বিবাহের কারণে নারী শারীরিক-মানসিক, যৌন ও আর্থিক নির্যাতনের শিকার হয়। শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৬৬ শতাংশ বাল্যবিবাহ হচ্ছে। আর

ইউনিসেফ প্রকাশিত হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০১৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৭১ শতাংশ এবং শহরে ৫৪ শতাংশ মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে বিবাহ হয়। সরকার ২০২১ সালে বাল্যবিবাহ ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে যে ঘোষণা দিয়েছে তার সঙ্গেও এ আইন সাংঘর্ষিক। ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বাল্যবিবাহ ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেবল শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য নয়, বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবিতে এ দেশের প্রগতিশীল নারী সংগঠনসমূহ দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে। অথচ সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধের নামে যে খসড়া আইন প্রণয়ন করছে, তাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিবাহ তথা শিশু বিবাহকে কার্যত বৈধতা দেয়া হবে।

এই আইন বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। শিশু অধিকার সনদ ও সিডও সনদকেও তা লঙ্ঘন করেছে। একই সাথে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ও শিশু আইন ২০১৩ কে লঙ্ঘন করেছে। শুধু তা-ই নয়, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) সহ অন্যান্য বিধি-বিধানের বিপরীতে সরকার এ আইন পাস করতে যাচ্ছে। এই আইনের ফলে বাংলাদেশের কিশোরীদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বাড়বে স্বাস্থ্যঝুঁকি, সংকুচিত হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, বাড়বে নারী নির্যাতন। সর্বোপরি পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে নারীর সমঅধিকার-সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ভূলুণ্ঠিত হবে। নারীর মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে নারীর প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আরো পাকাপোক্ত হবে এবং নারীর অধস্তনতা বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে সরকারের এই সিদ্ধান্ত পশ্চাৎপদ চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে মৌলবাদী শক্তির হাতকে আরো শক্তিশালী করবে। আর নিরাপত্তাহীনতার যে অজুহাত তোলা হয়েছে, তার দায়ভার নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়া অনৈতিক ও অযৌক্তিক। এসব কারণে বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলোসহ প্রগতিশীল গোষ্ঠী 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬' শীর্ষক খসড়া আইনের বিশেষ বিধান বাতিল করে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর বহাল রাখার দাবি করছে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৬৬ শতাংশ বাল্যবিবাহ হচ্ছে। আর ইউনিসেফ প্রকাশিত হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০১৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৭১ শতাংশ এবং শহরে ৫৪ শতাংশ মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে বিবাহ হয়। সরকার ২০২১ সালে বাল্যবিবাহ ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে যে ঘোষণা দিয়েছে তার সঙ্গেও এ আইন সাংঘর্ষিক।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত) এ ধর্ষণের সংজ্ঞায় পেনাল কোড ১৮৬০ এর XLV Act এর অনুরূপ বিধান রাখা হয়েছে। পেনাল কোডের ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী ১৪ বছরের চেয়ে কম বয়সী শিশুকন্যাদের ক্ষেত্রে সম্মতিসহ বা বিনা সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপন ধর্ষণ বলে অভিহিত হবে (Fifthly. With or without her consent, when she is under fourteen years of age)। তবে দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৫ এর 'ব্যতিক্রম' অনুযায়ী "যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যৌন সহবাস করে এবং স্ত্রীর বয়স যদি ১৩ বছরের কম না হয় তবে ধর্ষণ বলে গণ্য হবে না।" (Exception. Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under thirteen years of age, is not rape.) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত) এর ধারা ২ (ট) এ বলা হয়েছে : "'শিশু' অর্থ অনধিক ১৬ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি" এবং ধারা ৯ (১) এ বলা হয়েছে, "যদি কোন পুরুষ বিবাহবন্ধন ব্যতীত ১৬ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ১৬ বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।"

১৯৯৫ ও ২০০০ সালে করা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌন সম্মতির বয়স (Age of consent) ছিল ১৪, যেটি ২০০৩ এর সংশোধনীতে করা হয়েছে ১৬, যদিও পেনাল কোড অনুযায়ী এটি অবিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে ১৪ এবং বিবাহিতের ক্ষেত্রে ১৩। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী 'শিশু'র সংজ্ঞা হচ্ছে, অনধিক ১৬ বছরের ব্যক্তি, আবার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ অনুযায়ী, শিশু হচ্ছে অনধিক ১৮ বছরের নারী। ফলে এই সমস্ত আইন পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বলে নারী আন্দোলনের কর্মীরা প্রথম থেকেই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশোধনীর দাবি তুলেছিল, দাবি করেছিল এখানেও শিশুর সংজ্ঞা এবং যৌন সম্মতির বয়স পরিবর্তন করে অনধিক ১৮ বছর করার। 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' সংশোধন করা হয় ২০০৩ সালে। সংশোধনীতে ২ (U) ও ৯ (১) ধারায় ১৪ বছরের জায়গায় শিশুর বয়স এবং যৌন সম্মতির বয়স ১৬ বছর করা হয়। স্বভাবতই বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ (১৯৮৪ সালে সংশোধিত) এর সাথে ফাঁক থেকেই যায়। নারী আন্দোলন কর্মীরা এই ফাঁক নিরসনে ২ (ট) ও ৯ (১) ধারা সংশোধন করে শিশুর বয়স ১৮ বছর করার এবং ২ (ঙ) ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা থেকে পেনাল কোডের ৩৭৫ ধারা উল্লেখ এর বদলে বর্তমান আইনের ৯ (১) ধারায় থাকা সংজ্ঞা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার দাবি জানিয়ে এসেছে।

অথচ আইনগুলোর মধ্যকার এই বিরোধ নিরসনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পরিবর্তন না করে সরকার ২০১৪ সালে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪' এর খসড়ায় নারীর ন্যূনতম বিয়ের বয়সই কমিয়ে ১৬ বছর করার প্রস্তাব করেছিল। প্রতিবাদের মুখে সেখান থেকে পিছিয়ে এলেও, আবারও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬ এর খসড়ায় নারী শিশুর সংজ্ঞায় অনধিক ১৮ বছর রাখা হলেও 'বিশেষ বিবেচনায়' আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে যে কোনো বয়সের শিশুর সাথে বিবাহের অনুমোদন দেয়া হলো! আদতে এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিরোধের বদলে বাল্যবিবাহের আইনগত বৈধতা প্রদান করা হলো। সে কারণে এই আইনকে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' এর বদলে 'বাল্যবিবাহ বৈধকরণ আইন' হিসেবে অভিহিত করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তি

গত ৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে এই খসড়া আইনের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, "বাল্যবিবাহ আইন নিয়ে ঘাবড়ানো কিংবা চিন্তিত হবার কিছু নেই। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে। যাঁরা কোনো দিন গ্রামে বাস করেননি, গ্রামের সমাজ সম্পর্কে জানেন না, শুধু একবার গেলাম আর দেখলাম, কথা বললাম–এসব করে সমাজ সম্পর্কে জানা হয় না। দিনের পর দিন গ্রামে বসবাস করলে গ্রামের বাস্তব অবস্থা ও গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উপলব্ধি করা যায়, জানা যায়।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা সব কিছু বিবেচনা করে এই বাল্যবিবাহ আইনটা করেছি। বাস্তবতাকে সামনে রেখেই করা হয়েছে। কিছু কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এটা নিয়ে অনেক কথা বলছে। যাঁরা কথা বলছেন, তাঁরা কিন্তু একটানা দুই-চার বছর গ্রামে বসবাস করেননি। তাই এ সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই নেই।" তিনি বলেন, "আমাদের দেশে কিছু বিষয় আছে, সে বিষয়গুলো নিয়ে তাঁরা কখনো ভাবেন না, যেহেতু বাস্তবতা থেকে তাঁরা অনেক ঊর্ধ্বে। রাজধানীতে বসবাস করে, রাজধানীর পরিবেশ তাঁরা দেখেন। বাস্তব অর্থে গ্রামীণ অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা জানেন না।" যুক্তি উপস্থাপন করে সরকারপ্রধান বলেন, "প্রত্যেক আইনেই যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে সেখানে কী করণীয় তার একটা সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। সেটা যদি না দেয়া হয় তাহলে এই সমাজের জন্য অনেক বড় একটা বিপর্যয় নেমে আসবে।" তিনি বলেন, "আমরা ১৮ বছর বিয়ের বয়স নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু আপনারা চিন্তা করেন, একটা মেয়ে যে কোনো কারণেই হোক যদি ১৩-১৪ বছর বয়সে প্রেগনেন্ট (গর্ভবতী) হয়ে গেল, তাকে অ্যাবরসন (গর্ভপাত) করানো গেল না। যে শিশুটি নেবে সেই শিশুটির অবস্থানটা কোথায় হবে? তাকে কি সমাজ গ্রহণ করবে? তাকে কি বৈধভাবে নেবে? বাস্তবতা হচ্ছে, নেবে না।" প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন রেখে বলেন, "এ রকম যদি কোনো একটা ঘটনা ঘটে তাহলে কী হবে? যে শিশুটার জন্ম হলো তার কী হবে? যে মেয়েটা সন্তান জন্ম দিল তার অবস্থাই বা কী হবে? এই ধরনের যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে সেখানে যদি বাবা-মা এবং কোর্টের মতামত নিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে মেয়েটা বেঁচে গেল। আর যে বাচ্চাটা হলো সেও বৈধতা পেল। এই শিশুটি একটা ভবিষ্যৎ পেল।" তিনি বলেন, "ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির (পশ্চিমা বিশ্বে) অনেক দেশে ১৪ বছর বিয়ের বয়স। কোথাও আছে ৯ বছর বিয়ের বয়স। সেই সব জায়গায়, বিশেষ করে ইউরোপ-ইংল্যান্ড-আমেরিকায় টিনএজ মাদারের সংখ্যা অসংখ্য। এটা একটা সামাজিক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে। কারণ এই সমস্ত বাচ্চা মেয়েরা ১২/১৩/১৪ বছরে মা হয়ে যায়। কারণ তারা কিন্তু অ্যাবরসন করাতে চায় না। বাচ্চাটাকে যদি লেখাপড়া করাতে হয় তাহলে ওই দেশে কিন্তু প্রশ্ন করে না বৈধ সন্তান না অবৈধ সন্তান। বাবা-মায়ের নাম কী–এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু আমাদের দেশে আগে জিজ্ঞেস করবে বাপের নাম কী, মায়ের নাম কী? বাচ্চাকে বিয়ে দিতে গেলে ছেলে হোক মেয়ে হোক, অবৈধ সন্তান বিয়ে হবে না। চাকরি দেবে না।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এটা কোনো বিষয় না। আমাদের দেশে এটা নেই। বাবা-মা অবৈধ সন্তান জন্ম দেয়া মেয়েটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, ভবিষ্যতে মেয়েটাকে পতিতালয়ে যেতে হবে। আমাদের এখানে যাঁরা বাল্যবিবাহ আইন নিয়ে কথা বলছেন, তাঁরা কি এই বাস্তবতাটা চিন্তা করেন? তাঁরা এই বাস্তবতা চিন্তা করেন না বলেই নানা কথা বলেন।" ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তাঁরা দুইটা এনজিও করে পয়সা কামান। আমি যতক্ষণ সরকারে আছি, আমি মনে করি, এটা আমার দায়িত্ব যে সমাজে সে সন্তানটাকে জায়গা করে দেয়া। এ কারণেই বাল্যবিবাহ আইনে এই বিশেষ বিধানটা আমি রেখেছি। এটা অত্যন্ত একটা বাস্তবসম্মত চিন্তা, যেটা সম্পর্কে এনাদের (বিরোধিতাকারী) কোনো ধারণা নেই। আমরা এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করছি।"

প্রধানমন্ত্রীর বিক্ষোভের কারণ অননুমেয় নয়। দীর্ঘদিন ধরেই সরকার এ আইনটি পরিবর্তনের চেষ্টা করে আসছে এবং প্রতিবারই প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে তাঁদের ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। প্রধানমন্ত্রী তাই এই খসড়া আইনসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী অংশকে 'দুইটা এনজিও করে পয়সা কামানো' বলে অভিহিত করে জানিয়েছেন, তারা গ্রামে যায় না, গ্রামীণ বাস্তবতা বুঝতে পারে না...প্রভৃতি। অথচ প্রধানমন্ত্রী মহোদয় আমাদের গ্রামীণ বাস্তবতায় যে বাল্যবিবাহের অভিশাপ সবচেয়ে প্রকট সেটিই আড়াল করেছেন। প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দেখিয়েছেন, অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান চলে এলে বিয়ে দেয়াই একমাত্র উপায় হতে পারে, সে রকম ক্ষেত্রে এই বিশেষ বিধান বিশেষ কাজে লাগবে। বাস্তবে এর মধ্য দিয়ে ধর্ষণকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা শিশুদের সাথে সম্মতিতেও যৌন সম্পর্ক করা হলে ধর্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ দ্রষ্টব্য) যেখানে ধর্ষককে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে এ রকম ঘটনার প্রকোপ কমানোর কথা, সেখানে ধর্ষণের ফলে অনাগত শিশুর ভবিষ্যতের কথাকে অজুহাত হিসেবে ধর্ষককে কেবল দায়মুক্তিই দেয়া হচ্ছে না, ধর্ষকের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা উদাহরণস্বরূপ দেয়া হচ্ছে। কেবল শিশু ধর্ষণের ক্ষেত্রেই নয়, যে কোনো বয়সের নারীকে ধর্ষণের ক্ষেত্রেই অনাগত শিশুর কী হবে–এটি একটি মানবিক প্রশ্ন। প্রচলিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী 'ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান' এ 'ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশুর ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান আছে, কিন্তু এখানে ধর্ষকের সাথে বিয়ের কথা বলা হয়নি। ফলে সংসদে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রচলিত আইন পরিপন্থী। এর বাইরে তিনি পাশ্চাত্য সমাজের সাথে যে তুলনা টেনেছেন, সেটিও অপূর্ণাঙ্গ ও ভ্রান্ত। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, শিশু মাতৃত্বের হার এখনো আফ্রিকা ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে সর্বোচ্চ। ইউরোপ-আমেরিকায় অল্প বয়সে মাতৃত্বের সমস্যাটি তারা গুরুত্বের সাথে দেখছে মানে এই নয় যে আমাদের মতো দেশগুলোর মতোই সেখানে এই শিশু মাতৃত্বের হার উচ্চ। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে যেখানে শিশু মাতৃত্বকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সাদরে বরণ করা হয়, সেখানে পাশ্চাত্যের এই দেশগুলোতে শিশু মাতৃত্বকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোনোমতেই পাশ্চাত্যের উদাহরণ টেনে আমাদের দেশে শিশু মাতৃত্বের কথা বলে শিশুদের বিবাহকে উৎসাহিত করার উপায় নেই, কেননা আমাদের দেশে শিশু মাতৃত্বের বড় কারণ শিশুবিবাহ তথা বাল্যবিবাহ।

জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, শিশু মাতৃত্বের হার এখনো আফ্রিকা ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে সর্বোচ্চ।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের খসড়াটি পর্যালোচনা করতে চাই।

এই আইন নারীর গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী

একটা গণতান্ত্রিক সমাজে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী হবে? অবশ্যই তা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সকল মানুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে প্রণীত হবে। শাসকদের অগণতান্ত্রিক শাসনের ফলে সমাজে বা রাষ্ট্রে যে পশ্চাৎপদতা তৈরি হয়েছে, তাকে স্থায়ী করতে আইন প্রণীত হলে তাতে ভোটের রাজনীতির সুবিধা হয়, কিন্তু সমাজ আরো পিছিয়ে যায়। ইতিহাস থেকে আমরা জানি–ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর সমঅধিকার, সমমর্যাদার দাবি হঠাৎ করে আসেনি। তার জন্য শত শত বছর লড়তে হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে বেগম রোকেয়ার মতো মানুষদের সমাজের পশ্চাৎপদতা, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। একাত্তরে এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছিলাম, তার প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজ থেকে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটবে, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, ধর্মের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র মানুষকে বিবেচনা করবে না, পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই গত ৪৬ বছর ধরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি এই লক্ষ্যের বিপরীতে পরিচালিত হয়েছে। প্রস্তাবিত এ আইনটি তাই একদিকে যেমন সমাজ বিকাশের ধারায় গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনারও পরিপন্থী।

দশম শ্রেণির ছাত্রী শারমিন আক্তার নিজেই নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকিয়েছিল। শারমিন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিল, "বাংলাদেশে যেন বাল্যবিবাহ শব্দটি না থাকে" এবং অভিভাবকদের আহ্বান জানিয়েছিল, "মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিন। কোনো মেয়ে যেন অসহায় না থাকে। দুই কোটি কিশোরী মিলে দেশকে জয় করব।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান জাতীয়, আন্তর্জাতিক সনদ ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন

১. আইনে উল্লিখিত 'বিশেষ ক্ষেত্র' বা 'বিশেষ প্রেক্ষাপট' কথাটি বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিরোধী। অনুচ্ছেদ ২৭ এ বলা হয়েছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।" অনুচ্ছেদ ২৮(১) এ বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।" উল্লিখিত দুইটি অনুচ্ছেদে নাগরিক হিসেবে নারীর যে অধিকার লাভের কথা বলা হয়েছে, এই আইনের বিশেষ বিধান তাকে খর্ব করেছে।

২. এই 'বিশেষ ক্ষেত্র' কথাটি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা ১৯৪৮, সিডও সনদ ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ এর সাথেও সাংঘর্ষিক। শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে 'শিশু' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ এ ১৮ বছরের নিচের সকল ব্যক্তিকে 'শিশু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। শিশু আইন ২০১৩ এর ৪ ধারায় উল্লেখ আছে, "বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি 'শিশু' হিসাবে গণ্য হইবে।"

৪. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এ ১৮ বছরের নিচের মানব সন্তানকে 'শিশু' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৫. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী, বিবাহের পাঁচটি শর্তের মধ্যে প্রথম শর্ত হলো বয়স, দ্বিতীয় শর্ত সম্মতি। 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে এই প্রধান দুইটি শর্তকে উপেক্ষা করা হবে, যা বিবাহ সংক্রান্ত আইনের লঙ্ঘন। কেননা এই আইন অনুযায়ী বিবাহ একটি সামাজিক ও দেওয়ানি চুক্তি। চুক্তি সম্পাদিত হয় মূলত প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের দুইজন মানুষের মধ্যে। বাল্যবিবাহের বিশেষ বিধান চুক্তির এই শর্তও লঙ্ঘন করেছে।

৬. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "বিবাহ ব্যতীত ১৬ বছরের অধিক বয়সের কোনো নারীর সাথে তার অসম্মতিতে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে সম্মতি আদায় করে অথবা ১৬ বছর বয়সের কম কোনো নারীর সম্মতিসহ বা সম্মতি ছাড়া যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তা নারী ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে।" ফলে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান বিবাহের মাধ্যমে শিশু ধর্ষণকে আইনসম্মত করেছে এবং অন্যদিকে ধর্ষকের অপরাধকেও আইনসিদ্ধ করেছে।

৭. সাবালকত্ব আইন ১৮৭৫ অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির বয়স ১৮ বছর হলেই সে সাবালক হয় এবং সে তার মতামত প্রকাশ ও প্রদান করতে পারে। বাল্যবিবাহের বিশেষ বিধান এই আইনেরও লঙ্ঘন।

স্পষ্টতই বোধগম্য, 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬' শীর্ষক খসড়া আইনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন ও সনদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র

বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০০৭ এর তথ্য অনুযায়ী, ১৮ বছরের আগে ৬৬ শতাংশ মেয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। গত দুই দশক ধরে এই হার অপরিবর্তিত রয়েছে। আবার ওই ৬৬ শতাংশের এক-তৃতীয়াংশ ১৯ বছর হওয়ার আগেই গর্ভবতী হচ্ছে। বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল বিষয়ক কার্যক্রম (ইউএনএফপিএ) এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, পৃথিবীর সেরা ১০টি দেশের মধ্যে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর ২০১০ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ৬৯ শতাংশ নারীর ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের হার ২০০৯ সালে ছিল ৬৪ শতাংশ, যা ২০১১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬৬ শতাংশে। বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ের হার ৩৯ শতাংশ! গ্রাম-শহরের পার্থক্যটাও উল্লেখযোগ্য– গ্রামের ৭১ শতাংশ মেয়ে আর শহরের ৫৪ শতাংশ মেয়ের বিয়ে ১৮ বছরের আগে হচ্ছে। বাংলাদেশ আর সব জাতিসংঘের মিলেনিয়াম গোলে খুব ভালো সক্ষমতা দেখাতে পারলেও যে দুটি উদ্দেশ্য পূরণে একদমই পেছনে পড়ে আছে সেই

দুটি হচ্ছে, বাল্যবিবাহের হার কমানো এবং শিশুকালীন গর্ভধারণের হার কমানো।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার বাড়বে

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সমান। মাধ্যমিক স্তরে ৫৩ শতাংশ, কলেজ পর্যায়ে ৪৭ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষায় ৩৩ শতাংশ মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ করছে। ইউনিসেফের 'উইমেন্স লাইফ চয়েস অ্যান্ড অ্যাটিচুডস ২০১৪' এর গবেষণায় দেখা গেছে, বিবাহ সংক্রান্ত কারণে ২৪ শতাংশ মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর সরকারের অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের সংখ্যা ৩০ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ৭০ শতাংশ কিশোরী লেখাপড়া থেকে বাদ পড়ে যায় (*প্রথম আলো, ২২ নভেম্বর ২০১৬*)। আমাদের দেশের মেয়েদের পশ্চাৎপদ অবস্থানের চিত্র বুঝতে এ তথ্যই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যায়, সুনামগঞ্জের ধরমপাশা উপজেলার মধ্যনগর পাবলিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী মিতু মালাকারের কথা। সহপাঠীরাই তার বাল্যবিবাহ ঠেকিয়েছিল। আবার ঝালকাঠির রাজাপুর পাইলট স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী শারমিন আক্তার নিজেই নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকিয়েছিল। শারমিন তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিল, "বাংলাদেশে যেন বাল্যবিবাহ শব্দটি না থাকে" এবং অভিভাবকদের আহ্বান জানিয়েছিল, "মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিন। কোনো মেয়ে যেন অসহায় না থাকে। দুই কোটি কিশোরী মিলে দেশকে জয় করব।" শারমিন গ্রামেরই মেয়ে। সেদিন সাহসের সাথে মিতুর সহপাঠীরা ও শারমিন যদি প্রতিবাদ না করত তাহলে তারা দুজনেই এসএসসি উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়ত। ১৮ বছরের আগে বিয়ে নয়–এই বক্তব্যের সাথে তারা পরিচিত ছিল বলে এই পদক্ষেপ নিতে পেরেছিল। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শিক্ষক ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও টিএনও। কিন্তু বর্তমান আইনে বিশেষ বিধান বহাল থাকলে মিতু ও শারমিনদের পাশে যেমন আইন থাকবে না, তেমনি থাকবে না শিক্ষক সমাজ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন। ফলে এই আইন ওই কিশোরীদের জীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

বর্তমান আইনে বিশেষ বিধান বহাল থাকলে মিতু ও শারমিনদের পাশে যেমন আইন থাকবে না, তেমনি থাকবে না শিক্ষক সমাজ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন।

মাতৃমৃত্যুর হার ও মাতৃস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়বে

১৮ বছরের আগে নারীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হয় না। ফলে শিশুর ওজন কম হবে, অপুষ্টিতে ভুগবে, সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে শিশু বিকশিত হতে পারবে না। ভগ্নস্বাস্থ্যের মা ভগ্নস্বাস্থ্যের শিশু জন্ম দেবে–এটাই স্বাভাবিক। সন্তান যখন গর্ভে থাকে তখন মাকে পুষ্টিকর খাবার দেয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের দেশের কয়জন মানুষের আছে? মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৭টি দেশের মধ্যে ১৪৭তম। বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে ৪৫ শতাংশ মানুষ; যদিও সরকারের হিসাব অনুযায়ী তা ২২.৪ শতাংশ। দি ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভের তথ্য অনুযায়ী, "বাংলাদেশে সন্তান প্রসবের সময় প্রতি লাখে ১৭০ জন নারী মৃত্যুবরণ করে। প্রতি হাজারে ২৪ জন নবজাতক মৃত্যুবরণ করে, এই নবজাতকের মৃত্যুহারে পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। ৭১ শতাংশ নারীর পারিবারিক আয়োজনে প্রসবকালীন সেবা দেয়া হয় এবং মাত্র ৩৬ শতাংশ নারী দক্ষ ধাত্রীর সহযোগিতা পায়।"

এ রকম পরিস্থিতিতে সরকার শিশুর বিবাহকে আইনে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে! বাল্যবিবাহের কারণে নারীরা যৌনরোগ, গর্ভকালীন জটিলতা, প্রসবকালীন স্বাস্থ্যঝুঁকি, জরায়ুমুখে ক্যান্সার, ফিস্টুলাসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হবে। বহু বছর আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বলেছিলেন, "...সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য তাহাও বাল্য পরিণয়যুক্ত ক্ষয় পায়। ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।" আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ সম্পর্কে এই বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। অথচ তথাকথিত ডিজিটাল বাংলাদেশে 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' মেয়েদের বিয়ের জন্য সরকার আইনে বিশেষ বিধান রেখেছে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হবে

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক। বাংলাদেশে ১৮ বছরের আগে নারী বা পুরুষ কেউ নাগরিক অধিকার লাভ করে না। ফলে বিশেষ ক্ষেত্রে 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' নারীর বিবাহকে আইনসিদ্ধ করলে তা ওই নারীর জন্য বিপদ ডেকে আনবে। কারণ ১৮ বছরের নিচে যখন একজন নারী মা হবে তখন ওই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া কঠিন হবে।

বিশেষ বিধান কি নারীর নিরাপত্তাহীনতা কমাবে?

সংবাদপত্রের প্রকাশিত খবর অনুযায়ী দেশে প্রতিদিন তিনজন নারী ধর্ষণের শিকার হয় (ঢাকা ট্রিবিউন, ১ জুলাই ২০১৬)। সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে বিবাহিত নারীদের শতকরা ৮০ জনই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয় স্বামীর হাতে। আর কিশোরীরা প্রতিদিন তটস্থ থাকে কখন বখাটেরা তাদের উত্ত্যক্ত করে! আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ১৪৮টি উত্যক্ততার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৬ সালে শিশু ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে ১৪ শতাংশ। এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো মা-বাবা কি তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বাঁচাতে পারবেন? বিয়ের পর সন্তান ধারণের ঝুঁকি, আর্থিক অনটন, অপুষ্টিসহ যে দুর্বিষহ অবস্থায় তারা পতিত হবে, সেখানে সে বাঁচবে কী করে?

বিবাহ নারীর জন্য নিরাপদ থাকার একমাত্র পথ নয়, পথ হলো মনুষ্যত্ব-বিবেক-সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে বাঁচার লড়াই।

আবার নিরাপত্তাহীনতার কারণেই মা-বাবা মেয়েকে যদি বিয়ে দেন তাহলে কি মেয়ে নিরাপদ থাকবে? গত ১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলে যৌতুকের কারণে ফাতেমা আক্তার লিয়াকে তার স্বামী নির্মম ও নৃশংসভাবে নির্যাতন করেছে। ১৮ ডিসেম্বর সিলেটে পাঁচ লাখ টাকা যৌতুকের জন্য সোমা বেগমের জিহ্বা কেটে নিয়েছে তার স্বামী (সূত্র : প্রথম আলো)। ফলে বিবাহ নারীর জন্য নিরাপদ থাকার একমাত্র পথ নয়, পথ হলো মনুষ্যত্ব-বিবেক-সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে

বাঁচার লড়াই। যে মা-বাবা মেয়ের নিরাপত্তাহীনতার কথা ভাবছেন, আপনারা কি এই সমাজে নিরাপদ? সকালে বাড়ি বা বাসা থেকে বের হলে নিরাপদে ঘরে ফিরবেন তার নিশ্চয়তা কি সমাজে বা রাষ্ট্রে আছে? উত্তর, নেই। আপনার নিরাপত্তা নেই, আর এ ক্ষেত্রে মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা আরো বেশি। ফলে সরকার মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে ক্ষমতার নিরাপত্তা নিয়ে।

নারীর সমঅধিকার-সমমর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হবে

আইনের বিশেষ বিধান নাগরিক হিসেবে নারী-পুরুষের সমঅধিকার-সমমর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে খর্ব করেছে। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে নারী একদিকে পুঁজির শোষণের শিকার, অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজব্যস্থায় নারী পুরুষের অধীন। খসড়া এই আইনের ফলে নারীর ওপর উল্লিখিত দ্বৈত শোষণ আইনিভাবে আরো পাকাপোক্ত হবে। নারীর প্রতি সমাজমননে যে নেতিবাচক ধারণা আছে তা-ও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াবে। পারিবারিক আইনসহ সকল ক্ষেত্রে নারী এখনো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের কথা বললেও সিডও সনদের ধারা ২ এর 'বৈষম্য বিলোপ নীতি' ও ধারা ১৬ এর ১ (গ) এ উল্লিখিত 'বিবাহ ও বিচ্ছেদকালে নারী ও পুরুষের একই অধিকার এবং দায়িত্বের' বিষয়টি এখনো সংরক্ষিত রেখেছে। নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সিডও সনদের পরিপূরক করে আইন তৈরির বিপরীতে সমাজের কূপমণ্ডূক চিন্তা-ধারণা, প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতিকেই সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। আমরা মনে করি, সমাজে নারীর সমঅধিকার-সমমর্যাদা, মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম-অংশগ্রহণের জন্য সকল নাগরিকের জন্য একই ধরনের আইন প্রণয়ন করতে হবে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান নারীসমাজের এই আকাঙ্ক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক।

আমরা আশা করি, সরকার তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়াবে। আর এর জন্য নারীসমাজের জন্য অবমাননাকর এই আইনের বিশেষ বিধান বাতিলের দাবিতে দেশের বিবেকবান মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

আমরা তাই দাবি তুলি :

১। 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬' শীর্ষক খসড়া আইনের ১৯ ধারার বিশেষ বিধান বাতিল করতে হবে।

২। শর্তহীনভাবে এই আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর রাখতে হবে।

৩। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত) এ শিশুর বয়স ও যৌন সম্মতির বয়স (Age of consent) ১৮ বছর করতে হবে, ধর্ষণের সংজ্ঞা থেকে পেনাল কোড ৩৭৫ কে বাদ দিতে হবে।

৩। ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। নারী-শিশু নির্যাতনকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করতে হবে। সর্বত্র নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। সিডও সনদের ২ এবং ১৬ এর ১ (গ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে সিডও সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫। সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার, সমমর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম-অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করতে হবে।

সীমা দত্ত: সভাপতি, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কমিটি
ইমেইল : narimuktikendra@gmail.com
অনুপম সৈকত শান্ত: প্রকৌশলী ও গবেষক
ইমেইল : anupam.shaikat@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯:
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=149
২। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০:
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=835
৩। পেনাল কোড ১৮৬০- ধারা ৩৭৫:
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=11
৪। সিডও সনদ :
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
৫। "'তবে' রেখেই হচ্ছে বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন" – বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৪ নভেম্বর ২০১৬ :
http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1247619.bdnews
৬। বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল সংসদে উত্থাপন; যুগান্তর, ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৬
:http://www.jugantor.com/online/national/2016/12/08/33303
৭। বাস্তব কারণেই বাল্যবিবাহ আইনে বিশেষ বিধান: প্রধানমন্ত্রী; বাংলা ট্রিবিউন, ডিসেম্বর ০৭, ২০১৬ :
http://www.banglatribune.com/national/news/163597
৮। বিয়ের বয়স কমানো শুভঙ্করের ফাঁকি হবে; অক্টোবর ০১, ২০১৪ :
http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/335221